প্রেমাঙ্কুর আতর্থী

MAHARAJA
BIR BIKRAM COLLEGE
LIBRARY

Class No .. ৮৩
Book No. মো.আ-৯৭
Accn. No.... ১৮৩৪
Date..... ১২.১১.৮৩২
TAPA—17-2 61—10,000

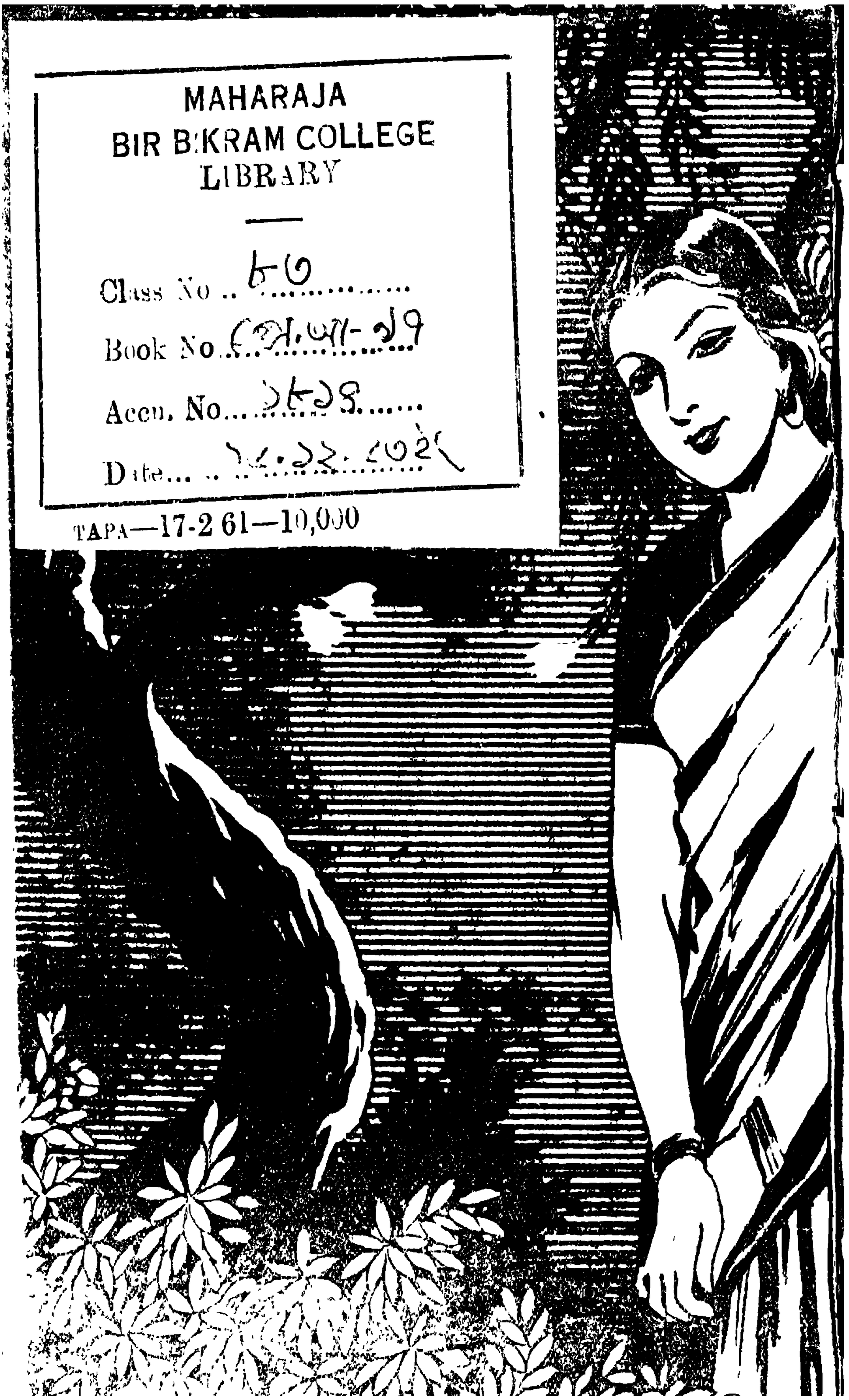

প্রকাশক—শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার
দেব-সাহিত্য-কুটীর
২২।৫বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা।

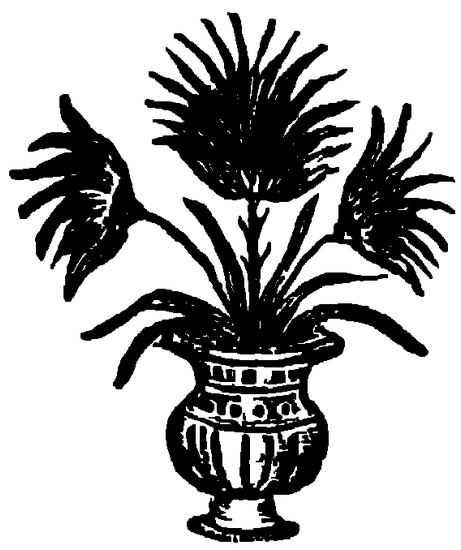

পুনর্মুদ্রণ
জ্যৈষ্ঠ—১৩৫২ সাল।

প্রিণ্টার—শ্রীবিভুতি ভূষণ কয়োড়ী
"কয়োড়ী প্রেস"
৩নং মদন মিত্র লেন, কলিকাতা।

উপহার

.....

.....

.....

কল্পনা দেবী

—এক—

দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন জন্মেছিলেন এ-যুগে বটে কিন্তু তাঁর মনটা বাঁধা ছিল সে-যুগের খোঁটায়। আধুনিক আবহাওয়ার ঝড়-ঝাপ্‌টা যতবার তাঁকে উড়িয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেচে ততবারই তিনি দ্বিগুণ বেগে সে-যুগের খোঁটার মূলে ফিরে এসেচেন।

ন্যায়রত্ন মশায়ের বাড়ী কলকাতার কাছাকাছি কোনো একটা শহরে। কলকাতার লোক এখন সে জায়গাকে শহর বল্‌বে না বটে কিন্তু কলকাতা যখন শহর হয়নি তখন এ স্থানকে লোকে বড় শহর বল্‌ত। কলকাতারই শহরত্ব প্রাপ্তির সঙ্গে-সঙ্গে এ স্থান গ্রাম্যদোষে দুষ্ট হোয়ে উঠেচে।

ন্যায়রত্ন মশায়ের শ্বশুরবাড়ীর হালচাল ছিল কিন্তু তাঁহাদের বাড়ীর একেবারে উল্‌টো। তাঁরা কলকাতাবাসী; সবেমাত্র সে-কালের দড়ি ছিঁড়েছেন। সদ্য দড়ি-ছেঁড়া গাভীর মতন গতি তাঁদের তখন উদ্দাম ও উচ্ছৃঙ্খল। বৈবাহিক বাড়ীর হালচাল দেখে ন্যায়রত্নের পিতা শিরোমণি মশায় শঙ্কিত হলেন। তাই মরবার আগে তাঁদের খোঁটাটির ভিত যাতে আরও বনিয়াদী হয় তার ব্যবস্থায় মন দিলেন। মৃত্যুশয্যায় তিনি দীন-বন্ধুকে বলে গেলেন—ছেলেদের ইংরেজী লেখাপড়া কখনো শিখিও না।

দীনবন্ধু ন্যায়রত্নের বাড়ীতে টোল ছিল। পিতার আশীর্ব্বাদে অবস্থাও ছিল বেশ সচ্ছল। মৃত্যুশয্যায় বাবার কাছে তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন ছেলেদের ইংরেজী বিদ্যা শেখাবেন না।

চাকরী কোরে খেতে হবে না। মিছিমিছি ইস্কুলে ইংরেজী শিখে কতকগুলো বদ অভ্যাস হবে।

বিমলা দেবী সেদিন আর স্বামীর সঙ্গে তর্ক করলেন না। রাত্রিবেলা সংসারের কাজ শেষ কোরে শোবার সময় ঘুমন্ত অজরের কপালে একটি চুমু খেয়ে শুয়ে পড়লেন। ঘুমের আগে কয়েক ফোঁটা অশ্রু তাঁর বালিশে গড়িয়ে পড়্ল।

ইংরেজী না শিখলেও অজর পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে মাঠে ফুটবল খেলতে যেতে লাগ্ল। তারপর মাঠ থেকে বাড়ীতে ফিরে যখন সে মাকে বল্ত—জান মা, আজ বাঁশতলা স্পোর্টিংকে তিনটি গোলে হারিয়ে আমরা 'সেমি-ফাইনালে' উঠলুম। যোগেশ যদি 'ড্রিবলিং' ছেড়ে দিয়ে ভাল করে 'স্যুট' করতে শেখে তা হোলে আমাদের 'ক্লাবের ফরোয়ার্ড'দের আটকাতে পারে এমন 'ডিফেন্স' কোনো ক্লাবেরই নেই—ইত্যাদি—তখন বিমলা দেবীর বুক গর্ব্বে ফুলে উঠ্ত। তিনি মনে করতেন, তাঁর মেধাবী ছেলে এমনি কোরে দু-একটা কথা শিখতে-শিখতেই ইংরেজীতে পরিপক্ক হোয়ে উঠ্বে। একদিন উৎসাহের মুখে তিনি স্বামীকে বলে ফেল্লেন—তুমি তো ছেলেকে ইস্কুলে দিলে না কিন্তু ও দিব্যি ইংরেজী কথা শিখ্চে।

ন্যায়রত্ন সমস্ত বৃত্তান্ত শুনে তখুনি অজরকে জিজ্ঞাসা করলেন—ফুটবল কি?

তারপর যখন বুঝতে পারলেন যে, লাথি খাওয়াই হচ্ছে সে জিনিষটীর ধর্ম্ম এবং তাঁর পুত্র সেই ইংরেজী বস্তুটীকে লাথাতে ওস্তাদ হোয়ে উঠেচে তখন তিনি মনে-মনে খুশীই হলেন।

ন্যায়রত্ন কখনো কলকাতায় যেতে চাইতেন না। তিনি বলতেন যে, ও-বাড়ীর সদর দরজার দরোয়ান থেকে আরম্ভ কোরে ভেতর বাড়ীর

অজর বল্লে—বেশ বেশ, তোমরা দেশের দিকে একটু মন দিলে দেশের কত উন্নতি হয়। তা তোমরা এখন হয়েচ কলকাতার বাবু।

সুনির্ম্মল বল্লে—কলকাতার বাবু না হয়ে কি করি বল! তোমার মতন খাবার-পরবার ভাবনা না থাকলে দেশেই থাকতুম। এখানে থাকলে তো আর অন্ন জুটবে না।

কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তার পর সুনির্ম্মল বল্লে—অজর, আজ সন্ধ্যাবেলা ভাই আমার ওখানে খাবে।

অজর কোনো কথা না বলে চুপ কোরে রইল। তাকে চুপ কোরে থাকতে দেখে সুনির্ম্মল বল্লে—কি, আমাদের ওখানে খেতে তোমার আপত্তি আছে নাকি?

সুনির্ম্মলের এই প্রশ্নে অজরের মনে কি জানি ছেলেবেলা মামার বাড়ীর সেই কাট্‌লেট খাওয়ার কথা মনে পড়্‌ল। সে বল্লে—না, আপত্তি আবার কিসের?

সুনির্ম্মল বল্লে—তবে ঐ কথা রইল। সন্ধ্যাবেলা নিশ্চয় যাবে।

সেদিন রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর অজরের সঙ্গে সুনির্ম্মলের অনেক কথা হোলো। কথায়-কথায় অজর সুনির্ম্মলকে গিয়ে জানালে যে, কলকাতায় গিয়ে থাকবার তার খুবই ইচ্ছা। একটা কাজ-কর্ম্ম সেখানে পেলে সে এখুনি চলে যায়।

সুনির্ম্মল অজরকে আশ্বাস দিয়ে বল্লে—কোনো চিন্তা নেই, আমি বাবাকে বলে তোমার একটা ব্যবস্থা কোরে দেবই।

সপ্তাহখানেক যেতে না যেতে অজর সুনির্ম্মলের কাছ থেকে চিঠি পেলে—পত্র-পাঠ চলে আসবে, কাজের যোগাড় হয়েচে।

সেই-দিনই সন্ধ্যাবেলায় অজর সুনির্ম্মলদের কলকাতার বাড়ীতে গিয়ে হাজির হোলো। চাকরী তার ঠিক হোয়ে গিয়েচে। শহরের একটী

মনে-মনে রাগ করচেন, কিন্তু আমাদের কলেজের নিয়ম হচ্ছে যে, অবিবাহিত পুরুষ শিক্ষক রাখা হবে না।

এবার অজর বল্লে—এ নিয়মটা তা হলে আপনাদেরই আমাকে জানানো উচিত ছিল। এমন অদ্ভুত নিয়ম যে কোথাও থাকতে পারে তা আমার জানা ছিল না।

লেডী প্রিন্সিপ্যাল বল্লেন—এ ক্ষেত্রে এখন উপায় কি! আচ্ছা আপনি ইতিমধ্যে বিবাহ করতে পারেন তো?

অজর গম্ভীরভাবে বল্লে—চাকরী রাখবার জন্য বিয়ে করা আমার দ্বারা হবে না। চাকরী আমি সখ কোরে করি—পেটের দায়ে নয়।

একটুক্ষণ চুপ কোরে থেকে আবার সে বল্লে—কোন্‌দিন আপনাদের খেয়াল হবে বিবাহিত পুরুষ শিক্ষক আর রাখা হবে না, তখন স্ত্রী ত্যাগ করতে হবে তো?

অজরের কথা শুনে লেডী প্রিন্সিপ্যাল হেসে ফেলে বল্লেন—দেখুন, আপনি অবিবাহিত এ কথা কর্ত্তৃপক্ষ জানলে তাঁরা আমার ওপরে চাপ দেবেন।

অজরের মনে হোতে লাগ্‌ল যে, কর্ত্তৃপক্ষেরই একজনের সুপারিশে তার এখানে চাকরী হয়েছিল। কিন্তু হয়ত সুনির্ম্মলের বাবাও জানেন না যে, সে বিবাহিত নয়। এ নিয়ে কথা কথাকাটি করতে তার আর প্রবৃত্তি হোলো না। সে বল্লে—বেশ, আজই আমি কর্ম্মত্যাগ-পত্র দাখিল করচি—আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

লেডী প্রিন্সিপ্যাল বল্লেন—আপনাকে ছাড়্‌তে আমার অত্যন্ত কষ্ট হচ্ছে। আপনার অধ্যাপনায় ও সহৃদয়তায় কলেজ-শুদ্ধ ছাত্রী মুগ্ধ। আপনার মতন লোক হয়ত আমরা আর পাব না—কিন্তু আমার অবস্থা বুঝে আমাকে ক্ষমা করবেন।

অজর বল্লে—ঠিক বলেচ। তারপর, এদেশে কি করতে? এখানে কি তোমার—

অজরের মুখের কথা শেষ করতে না দিয়েই শোভনা বল্লে—আপনি এখানে কি করতে এসেচেন তাই বলুন।

অজর বল্লে—এটা যে আমার দেশ গো। তোমাদের কাছে যে দেশের গল্প করতুম—তা এই আমার সেই দেশ। চল না আমার বাড়ী যাবে? কাছেই আমার বাড়ী, বেশী দূরে নয়।

অজর ও শোভনা পাশাপাশি চলতে লাগ্‌ল। অজর জিজ্ঞাসা করলে—তা তুমি এখানে কি করতে এসেচ তাতো বল্লে না।

শোভনা বল্লে—পণ্ডিত মশায় জানেন না বুঝি—এটা আমারও দেশ যে—

অজর হাসতে-হাসতে বল্লে—বটে! তা তো জানতে পারিনি। কবে থেকে?

শোভনা গম্ভীর ভাবে বল্লে—বছর দেড়েক থেকে।

অজর বল্লে—বেশ বেশ! বড় খুশী হলুম শুনে। তা কাদের বাড়ী?

কথা বলতে-বলতে তারা একটা মোড়ের মাথায় এসে পড়েছিল। অজরের বাড়ী যেতে হোলে এই মোড়ে ঘুরতে হয়। এইখানে দাঁড়িয়ে শোভনা মেয়ে-স্কুলের বাড়ীটা দেখিয়ে দিয়ে বল্লে—ঐ যে ঐ বাড়ীটা।

অজর অবাক হোয়ে বাড়ীটার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বল্লে—ওটা তো স্কুলের বাড়ী।

শোভনা এবার হাসতে হাসতে বল্লে—হ্যাঁ, ঐ আমার বাড়ী। আজ বছর দেড়েক হোলো এখানকার মেয়ে-স্কুলের শিক্ষয়িত্রী হোয়ে এসেচি। ঐ বাড়ীর ওপর তলাটা আমার। পরে মেয়ে বাড়্‌লে ও জায়গা আমায় ছেড়ে দিতে হবে—আমার অন্য বাড়ী ঠিক হবে।

কিছুক্ষণ দুজনেই চুপ কোরে রইল। তারপরে অজর বল্লে—এখানে কাজকর্ম্ম কেমন লাগ্‌চে, কোনো অসুবিধা হচ্ছে না তো ?

শোভনা বল্লে—কাজকর্ম্ম ভালই লাগ্‌চে। এখন তো মোটে ষষ্ঠশ্রেণী অবধি হয়েচে, ভবিষ্যতে এঁদের ইচ্ছা আছে যে ম্যাট্রিকুলেশন অবধি পড়ানো হবে। মেয়েরা আমায় খুব ভালবাসে। আমি ছাড়া আরও দু-জন শিক্ষয়িত্রী আছেন, তাঁরা এখানকারই লোক। কষ্টের মধ্যে বড় একলা লাগে।

অজর বল্লে—আশ্চর্য্য তো! এতদিন এখানে আছ, কোনো বাড়ীর সঙ্গে কি আলাপ পরিচয় হয় নি ?

শোভনা বল্লে—না পণ্ডিত মশাই। একে এতখানি বয়স অবধি বিয়ে হয়নি, তার ওপরে এই জুতো-মোজা-পরা মাষ্টার্‌নীকে কে কি বল্‌বে—এই ভয়ে কোথাও যাই নাই।

শোভনা অজরের মুখের দিয়ে চেয়ে দেখলে যে, সে বাগানের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে কি ভাব্‌চে। একটু পরে শোভনা আবার বল্লে—বড্ড যখন অসহ্য মনে হয় তখন আমাদের স্কুলের যে অন্য দুজন শিক্ষয়িত্রী আছেন তাঁদের বাড়ীতে যাই। কিন্তু তাঁরা কাজের লোক, বাড়ীতে ছেলে-পিলে, সংসার নিয়েই ব্যস্ত থাকেন। আমার সঙ্গেই গল্প করবেন না ঘরের কাজ দেখবেন। এখন আমার প্রধান বন্ধু হচ্ছেন আমার ঝি আর স্কুলের বুড়ো দরোয়ান তেওয়ারী।

অজর হেসে বল্লে—তা বেশ।

শোভনা বল্লে—মাঝে-মাঝে বেড়াতে বেরুই। গঙ্গার ধারের রাস্তা দিয়ে অনেক দূর অবধি চলে যাই। ভাগ্যে আজ বেরিয়েছিলুম, তাইত আপনার সঙ্গে দেখা হোয়ে গেল।

অজর বল্লে—আমার সঙ্গে আজ না হয় একদিন দেখা হোতোই।

—তিন—

সুধাংশু মুখোপাধ্যায় যখন একশো টাকা মাইনে পেত তখন অনেকেই বল্‌ত, লোকটা মোটা মাইনে পায়। সুধাংশু নিজে তার মাইনের আয়তন-টাকে খুব স্থূল মনে না করলেও সংসারে তার বিশেষ কোনো কষ্ট ছিল না। সংসারে তার বেশী লোকজন ছিল না। স্ত্রী ও একটী মাত্র মেয়েকে নিয়ে কলকাতার এক পল্লীতে কয়েকখানা ঘর ভাড়া কোরে সে থাক্‌ত—সুখে দুঃখে তার দিন একরকম কেটে যেত।

সুধাংশুর স্ত্রী স্বামীর ঐ আয় থেকে মাঝে-মাঝে পাঁচ দশ টাকা জমিয়েও রাখ্‌ত। তা ছাড়া দেশের সম্পত্তি বিক্রি কোরে হাজার তিনেক টাকা সুধাংশু ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রেখেছিল। তারা স্বামী স্ত্রীতে পরামর্শ কর্‌ত যে, তাদের ঐ একটি মাত্র মেয়ে তাকে বেশ ভাল পাত্রে দিতে হবে।

ভবিষ্যৎ জীবনের এই রকম একটা ছক মনের মধ্যে এঁকে নিয়ে সন্তর্পণে একটী একটী কোরে বোড়ে ঠেলে সুধাংশু এগিয়ে চলেছিল এমন সময় অকস্মাৎ ইউরোপে লেগে গেল মহা সমর। সুধাংশু নিজের অনুমানের মধ্যে প্রায় সব রকম সাংসারিক দুর্ঘটনার একটা হিসাব নিকাশ কোরে রেখেছিল। কিন্তু হাজার হোলেও সে বাঙালী কেরাণী—যুদ্ধের কথা তার কল্পনা শক্তির পরিধির বাইরে থাকায় সে কথা তার মাথায় আসেনি। সুধাংশুদের আপিস ছিল অষ্ট্রিয়ান সওদাগরদের। যুদ্ধ বাধতেই তাদের আফিস গেল উঠে, সঙ্গে-সঙ্গে মোটা মাইনের চাকর সুধাংশু হোয়ে গেল একদম বেকার।

সুধাংশু পাগলের মতন চারিদিকে চাকরীর জন্য ছুটোছুটি আরম্ভ

সময় শোভনার ভাগ্যবিধাতা অলক্ষ্যে হাসছিলেন। শোভনাকে পড়ানো সম্বন্ধে ছেলের অত্যধিক আগ্রহ দেখে রমেশের পিতামাতা কিছুদিন থেকেই শঙ্কিত হোয়ে উঠ্‌ছিলেন। তাঁরা ঠিক কোরে রেখেছিলেন যে, রমেশের বিয়েতে বেশ কিন্তু মোটা রকমের দাঁও কষবেন। দরিদ্র সুধাংশু সুন্দরী মেয়ের লোভ দেখিয়ে তাঁদের সে আশায় বঞ্চিত করতে উদ্যত দেখে শীগ্‌গীরই রমেশকে অন্যত্র কোথাও চালান করবার ব্যবস্থা করতে লাগলেন। রমেশ, শোভনা অথবা শিবপ্রিয়া কেউ তাঁদের মনের কথা ঘুণাক্ষরেও জানতে পারলে না। গোপনে তাঁদের বন্দোবস্ত চল্‌তে লাগ্‌ল।

কিছুদিন এইভাবে যায়। সেবার পূজোর সময় সুধাংশু একবার কলকাতায় এসে স্ত্রী ও মেয়েকে দিন-কতকের জন্য তার কর্ম্মস্থলে নিয়ে গেল। মাস দুয়েক বাদে ফিরে এসে তারা জানতে পারলে যে, রমেশ বিলেতে পড়তে গেছে, চার বছর বাদে দেশে ফিরবে।

রমেশের বিলেত যাওয়ার খবর শুনে শিবপ্রিয়া তো একেবারে দিশে-হারা হোয়ে পড়লেন। তিনি স্বামীকে সংবাদ পাঠালেন। সুধাংশু লিখলে—তোমায় তখুনি বলেছিলুম—এখন উপায়!

শিবপ্রিয়া আর কি উত্তর দেবেন! উপায় একমাত্র ভগবান্!

সুধাংশু আবার বন্ধুদের স্মরণ নিলে। এক হাজারের জায়গায় যৌতুকের মাত্রা দু-হাজার হোলো। বন্ধুরা অবসর-মত পাত্র দেখতে লাগ্‌ল।

দেখতে-দেখতে আরও বছরখানেক কেটে গেল। মাস চার-পাঁচ বাদেই শোভনার আই-এ পরীক্ষা; এমন সময় একদিন সকালবেলা জ্বরে কাঁপতে-কাঁপতে সুধাংশু বাড়ীতে এসে হাজির হোলো। কিছুদিন থেকে তার মাঝে মাঝে জ্বর হচ্ছিল। শেষকালে জ্বর আর ছাড়েনা দেখে তার

পড়্ছিল। স্বামী মারা যাবার পরই সে-ও শয্যাশায়ী হোয়ে পড়্ল। তার-পর শোভনার অক্লান্ত সেবা, প্রবাসী বন্ধুদের দিন রাত্রি চেষ্টা, যত্ন ও সহানু-ভূতি সমস্ত বিফল কোরে দিয়ে আর একদিন সন্ধ্যার সময় সে-ও মারা গেল।

শোভনা সংসারে একেবারে একলা পড়ে গেল। কলকাতায় সে কোথায় ফিরবে! তার কাছে যা অর্থ ছিল তা দিয়ে সেখানে বোর্ডিংয়ে থেকে দু-বছর বি-এ পড়া চলে না। দেওঘর থেকে সে রাধিকাবাবুদের কাছে মা-বাবার মৃত্যু সংবাদ লিখে পাঠালে। তাঁরা শোভনাকে এই বিপদে অনেক সহানুভূতি ও সান্ত্বনা দিয়ে চিঠি লিখলেন। কিন্তু তার মধ্যে এমন কোনো আহ্বান ছিল না যার ওপরে নির্ভর কোরে সে তাঁদের বাড়ীতে গিয়ে উঠতে পারে। বছরখানেক আগে যে সংসারকে শোভনা সুখের আগার মনে করত হঠাৎ দুটি লোকের অন্তর্দ্ধানে সেখানকার সমস্ত সৌন্দর্য্য তার চোখের সামনে থেকে ধুয়ে মুছে একেবারে সাফ হোয়ে গেল।

শোভনারা যাঁদের বাড়ীভাড়া কোরে ছিল, তাঁরা সেখানকার অনেক দিনের পুরোনো বাসিন্দা। তার অবস্থা দেখে তাঁরা শোভনাকে নিয়ে গিয়ে রাখলেন। দেওঘরে তাঁদেরই একটি মেয়ে-স্কুল ছিল। স্কুলটীর জন্য অনেক দিন থেকেই তাঁরা একজন ভাল শিক্ষয়িত্রী খুঁজছিলেন কিন্তু কম মাইনে বলে ভাল লোক পাওয়া যাচ্ছিল না। এই কাজটি শোভনাকে নিতে বলা মাত্র সে তখুনি তা গ্রহণ করলে। মা মারা যাবার মাসখানেক পরেই সেই দারুণ শোকের আগুন বুকে নিয়ে শোভনা সংসার ক্ষেত্রে নেমে পড়্ল।

বছরখানেক এইখানে চাকরী করবার পর একদিন কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে শোভনা এই চাকরীটীর জন্য দরখাস্ত করে। এখানে চাকরী স্থির হওয়ার পর একদিন সে কাঁদতে-কাঁদতে দেওঘর ছেড়ে নতুন কাজে এসে ভর্ত্তি হোলো।

অজয়ের সঙ্গে সম্পর্ক তার গুরু শিষ্যার কিন্তু তবুও যেন মনে হোতে

নেই। কিন্তু দেশের লোকের মুখ তো আপনি জানেন না। বিশেষ এই কথাটা যখন বিকৃত হোয়ে আপনার ছাত্রীদের কাণে উঠ্‌বে তখন তারা তাদের শিক্ষয়িত্রীর সম্বন্ধে কি ধারণা করবে! এইদিক দিয়েও কথাটাকে বিচার কোরে দেখবেন। আমি আপনার ওপরেই সমস্তটার বিচারের ভার দিচ্ছি। আপনি বুদ্ধিমতী—আমার কথাগুলো ভাল কোরে ভেবে দেখবেন।

সমর নমস্কার কোরে উঠে চলে গেল। শোভনা তাকে বিদায় কোরে আবার ওপরে উঠে এল। সে অজরের বাড়ীতে যাবার জন্য বেরুচ্ছিল কিন্তু তার আর বেরুনো হোলো না। একখানা চেয়ার জানলার ধারে টেনে নিয়ে এসে সে বসে বসে সমরের কথাগুলো ভাবতে লাগ্‌ল।

বাইরের এই করুণ দৃশ্য শোভনার অন্তরে একটা ব্যথার সুর জাগিয়ে তুলতে লাগ্‌ল। সে ভাবছিল, কী অসহায় অবস্থা তার! এখানে এই নিঃসহায় পুরীতে একমাত্র অজরই তো আত্মীয় বন্ধু ও সহায়। সমস্ত দিন চাকরী কোরে এক ঘণ্টা কি দু-ঘণ্টা যদি সে তার সঙ্গে গল্প কোরে কাটায় তা হোলে তার নিন্দা হবে! যারা তার নিন্দা করবে এতদিনের মধ্যে তাদের কেউ এসে তাকে ডেকে একটা কথাও তো জিজ্ঞাসা করেনি! অজরের সঙ্গে তার গুরু শিষ্যার সম্পর্ক, অজর চরিত্রবান্, অজর অজাত-শত্রু। এত গুণ তার! কিন্তু! একটী মেয়ে রোজ তার বাড়ীতে গল্প করতে যায়—এ ব্যাপারটা লোকে সাধারণভাবে নিতে পারলে না!

চিন্তায় শোভনা এত তন্ময় হোয়ে গিয়েছিল যে, সময়ের কোনো জ্ঞানই তার আর ছিল না। হঠাৎ সম্বিত ফিরে আসতেই সে বাইরের দিকে চোখ চেয়ে দেখলে সূর্য্য অনেকক্ষণ ডুবে গিয়েছে, বাইরে ঘন অন্ধকার, নদীর ওপারে দু-তিনটে আলো মিট্ মিট্ করচে।

শোভনার ঘরও অন্ধকার। তার ঝি মনে করেছিল দিদিমণি বেড়াতে

একটা কিছু ব্যাপার ঘটেচে। কিন্তু সে শোভনাকে সে সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন না কোরে বল্লে—আজ আমি তোমার এখানে কেন এসেচি জান শোভনা ?

সংসারের অবিচারের কথা মনে হওয়ায় শোভনার মনে তখন পুঞ্জে পুঞ্জে অভিমানের মেঘ সঞ্চিত হোয়ে উঠ্‌ছিল। হঠাৎ অজয়ের সেই প্রশ্ন শুনে তার বুকের মধ্যে ধড়ফড় করতে লাগ্‌ল। তার মনে হোলো—কি বল্‌বে অজয় তাকে! শঙ্কাকুল মুখভাব একটুখানি প্রফুল্ল করবার চেষ্টা কোরে সে জিজ্ঞাসা করলে—কি কথা ?

অজয় হাসতে হাসতে বল্লে—কাল সকালে আমি কলকাতায় যাচ্ছি।

শোভনা যেন হাঁপ্ ছেড়ে বাঁচ্‌ল। সে জিজ্ঞাসা করলে—কি এমন জরুরী কাজ পড়্‌ল সেখানে ?

অজয় গম্ভীর হোয়ে বল্লে—ভয়ানক জরুরী, পরশু আমার বিয়ে।

শোভনা আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠে বল্লে—সত্যি ?

অজয় বল্লে—হ্যাঁ সত্যি। আমার মামারা কলকাতার লোক জানো তো! আমার বড় মামী অনেকদিন থেকেই আমার বিয়ে দেবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন। শুধু আমার অনিচ্ছায় এতদিন কিছু কোরে উঠতে পারেন-নি।

শোভনা বল্লে—তা এতদিনে বুঝি ভাগ্নের মন ফিরেছে ?

অজয় বল্লে—হ্যাঁ, সংসারে থাক্‌ব আর সেখানকার রীতিনীতি মান্‌ব না ?

শোভনা হেসে বল্লে—খুব মানবেন—নিশ্চয় মানবেন। এতদিন না মেনে অন্যায়ই করেছেন।

একটু পরে শোভনা জিজ্ঞাসা করলে—মেয়েটী কোথাকার ?

অজয় বল্লে—মেয়েটীর বেশ দীর্ঘ ইতিহাস। তার বাপ কলকাতায় বড় কাজ করতেন। ছেলেবেলায় মা মারা যাওয়ায় মেয়েটীকে অত্যন্ত

—পাঁচ—

অজরের বিয়ে উপলক্ষ্যে শোভনার একটা সুবিধা হোয়ে গেল। সেই সুযোগে তার সেখানকার অনেকের সঙ্গেই আলাপ হোয়ে গেল। বৌ নিয়ে দেশে ফিরে অজরকে একদিন দেশের বন্ধু-বান্ধব আত্মীয় ও প্রতি-বাসীদের জন্য প্রীতিভোজের আয়োজন করতে হয়েছিল। পাড়ার অনেক বাড়ীর গিন্নি ও বৌঝিরা অজরের সাহায্যের জন্য এসেছিলেন। শোভনার এই সময় কিসের একটা ছুটী থাকায় সে-ও এই উৎসবে কোমর বেঁধে খাটতে লেগে গিয়েছিল। এই দু-তিন দিন একত্রে কাজকর্ম্ম করার ফলে অনেক বাড়ীর মেয়েদের সঙ্গেই তার আলাপ পরিচয় হোয়ে গেল।

কিন্তু যাকে উপলক্ষ্য কোরে এতগুলি লোকের সঙ্গে শোভনার পরিচয় হোলো তার সঙ্গেই তার ভাব জম্‌ল না।

অজর যেদিন সকাল বেলা বৌ নিয়ে ফিরে এল সেদিন স্কুল ছিল বলে শোভনা সকালে যেতে পারে নি। সে মনে করেছিল, নতুন বৌ, বিদেশে এসে হয়ত তার কতই মন খারাপ কর্‌চে। কত সহানুভূতির কথা বলে সে তাকে প্রফুল্ল করে তুল্‌বে। সারাদিন ধরে কত কথা, কত কল্পনাই না তার মনের মধ্যে লাফালাফি করছিল। কিন্তু বিকেলে বৌ দেখতে গিয়ে শোভনা একেবারে থম্‌কে গেল।

ইন্দিরার আঠারো বছর বয়স কিন্তু তাকে পঁচিশ বছরের বল্লেও অবিশ্বাস হয় না। ধপ্‌ ধপ্‌ করচে তার রং তার ভেতর থেকে রক্তাভা ফুটে বেরুচ্ছে। যার দিকে সে চায় তাকেই যেন সম্ভ্রমে মাথা নীচু করতে হয়। সহানুভূতি তো দূরের কথা, তার চারপাশের বৃদ্ধা, অর্দ্ধবয়সী, যুবতী—যারা তাকে ঘিরে ভিড় কোরে আছে তাদের প্রতি একটা অবহেলা ও অনুকম্পার

দৃষ্টি দিয়ে সে এমন একটা ব্যবধান সৃষ্টি কোরে আছে যে তা ভেদ কোরে যেন কেউ অগ্রসরই হোতে পারচে না।।

শোভনা ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে তাকে প্রণাম কোরে তার হাতে কয়েকটী টাকা দিয়ে বল্লে—তুমিই ভাই আমার বৌদি হও।

ইন্দিরা টাকা দেখে বল্লে—কিন্তু আপনাকে কোনো টাকা ধার দিয়েছিলুম বলে তো মনে হচ্ছে না। এ টাকা কিসের ?

ভিড়ের মধ্যে থেকে কে বলে উঠ্‌ল—বৌটি কিন্তু বাপু ভারি মুখরা।

ইন্দিরা একবার মাত্র ঘাড়টি ঘুরিয়ে সেদিকে চাইলে। ভিড়ের মধ্যে যে গুঞ্জন সুরু হয়েছিল তৎক্ষণাৎ তা থেমে গেল।

ইন্দিরা আবার বল্লে—টাকা কিন্তু আপনাকে ফিরিয়ে নিতে হবে।

শোভনা কি বলতে যাচ্ছিল এমন সময় সেখানে অজয় এসে পড়্‌ল। সে শোভনাকে দেখে বল্লে—ইন্দিরা এঁর নাম শোভনা! এ আমার ছাত্রী, তোমার ননদ।

ইন্দিরা এবার শোভনাকে বল্লে—দক্ষিণা যদি দিতে হয় তো আপনার গুরুকে দিন।

শোভনাকে কিন্তু টাকা কটি ফিরিয়ে নিতেই হোলো। সে ক্ষুণ্ণ হোলো বটে কিন্তু মনে মনে ভাবলে একটা কিছু গয়না গড়িয়ে পরে সে ইন্দিরাকে উপহার দেবে।

বিয়ে বাড়ীর গোল চুকে যাবার পর শোভনা প্রত্যহই অজয়দের বাড়ী যায় কিন্তু ইন্দিরার নাগাল আর পায় না। সে কখনো বাগানে, কখনো বই পড়ায়, কখনো বা ব্লাউসে ফুল তোলায় এত ব্যস্ত থাকে যে তার কাছে ঘেঁষ্‌তেই শোভনার সাহস হয় না। অজয়ের বিয়ের পর আজকাল সময়ও মাঝে মাঝে বিকেলে তাদের ওখানে আসে। ইন্দিরা মাঝে মাঝে অজয়ের পুরুষ বন্ধুদের সাম্‌নেও বেরোয়, তাদের সঙ্গে অসঙ্কোচে আলাপ

অজর ফিরে এসে কিছু না বলে চেয়ারখানার ওপরে ধপাস কোরে বসে পড়্ল। সে যে বাড়ীর মধ্যে ইন্দিরাকে শোভনার আগমন সংবাদ দিতে গিয়েছিল সে কথা সে আগেই বুঝতে পেরেছিল। অজর ফিরে আসতেই শোভনা তার মুখ দেখে বুঝতে পারলে যে তার মনের মধ্যে মেঘের সঞ্চার হয়েচে। হয়ত তাকে নিয়েই তাদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি হচ্ছে। কথাটা মনে হোতেই শোভনার অত্যন্ত বিশ্রী লাগ্তে লাগ্ল। সে উঠে বল্লে—আমি যাই পণ্ডিত মশাই!

অজর আপনার মনে যেন কি ভাবছিল। হঠাৎ শোভনা উঠে পড়তেই সে চম্কে উঠে বল্লে—এ্যাঁ—যাবে! এই তো এলে!

শোভনা বল্লে—হ্যাঁ যাই। আর এক সময় আস্ব'খন।

অজর কি রকম অপ্রস্তুতের মতন দাঁড়িয়ে রইল। শোভনা আর কোনো কথা না বলে আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

বাইরে বেরিয়ে এসেই শোভনা মনে করলে আর সে কখনো এ বাড়ীতে আস্বে না।

সেদিন শোভনা গঙ্গার ধার দিয়ে অনেকদূর পর্য্যন্ত বেড়িয়ে যখন বাড়ী ফির্ল তখন রাত্রি হোয়ে গিয়েচে।

পাঠিয়ে দিলে। কবিতাটি মাসিক পত্রের অঙ্গে ছাপার অক্ষরে দেখবার সৌভাগ্য সে কল্পনাও করতে পারে নি। কিন্তু সত্যিই যখন সেটা প্রকাশিত হোলো তখন শোভনা আনন্দে আত্মহারা হোয়ে উঠ্‌ল। এ আনন্দ তাকে রমেশের প্রথম চুম্বনের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে লাগ্‌ল!

শোভনা সাহিত্য সাধনায় নিজেকে একেবারে ডুবিয়ে দিলে। প্রতি মাসে নানা কাগজে কল্পনা দেবীর কবিতা প্রকাশিত হোতে লাগ্‌ল। মাঝে মাঝে তার মনে হোতো এ শক্তি এতদিন তার কোথায় লুকিয়ে ছিল।

একদিন বিকেলে শোভনা ঘরে বসে লিখ্‌চে এমন সময় দরোয়ান এসে জানালে—সেকেরটারী বাবু এয়েচে।

সমর স্কুল সম্বন্ধে কি সব প্রয়োজনীয় পরামর্শ করতে এসেছিল। তাদের কথাবার্ত্তা শেষ হোয়ে যাবার পর সে বল্লে—আপনি জানেন না বোধ হয়—অজরদার বড় অসুখ।

শোভনা চম্‌কে উঠে বল্লে—কার! পণ্ডিত মশাইয়ের কি অসুখ?

সমর বল্লে—অসুখটা যে কি তা বলতে পারিনা, তবে সাংঘাতিক-অসুখ। ডাক্তারেরা তো হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন। এখনো তাঁরা ঠিক কোরে কিছু বলতে পারচেন না।

শোভনা জিজ্ঞাসা করলে—কতদিন হয়েচে অসুখটা?

সমর বল্লে—তা প্রায় তিনমাস হলো।

শোভনা বল্লে—আজ তো রাত্রি হোয়ে গিয়েচে, কাল যাব।

পরদিন স্কুলের ছুটির পর কাজকর্ম্ম সেরে শোভনা যখন অজরদের বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হোলো তখন সন্ধ্যা হোয়ে গিয়েছে। শীতের সন্ধ্যা, পল্লীগ্রামে গৃহস্থদের ঘরে ঘরে সন্ধ্যা দীপ জ্বলে উঠেচে। কিন্তু অজরদের গৃহদ্বারে প্রদীপ নেই। শোভনা বাড়ীর মধ্যে ঢুক্‌ল, কোথাও

একটু আলো নেই। কোনো রকমে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে দূরে অজরের শোবার ঘরে আলো লক্ষ্য কোরে সেই দিকেই চল্‌ল।

চারিদিক স্থির, নিস্তব্ধ। শোভনা চৌকাঠের কাছে জুতো খুলে রেখে নিঃশব্দে ঘরের মধ্যে ঢুকল। ঘরের ঠিক মাঝখানে পুরোনো আমলের প্রকাণ্ড একখানা ভারী খাট পাতা। এক কোণে পেতলের পিলসুজের ওপরে একটা প্রদীপ জল্‌চে। প্রদীপের মৃদু আলোতে ঘরে নিস্তব্ধতাকে যেন আরও গভীর ও রহস্যময় কোরে তুল্‌ছিল। ঘরের মধ্যে লোকজন কেউ কোথাও নেই, শোভনা নিঃশব্দ পদসঞ্চারে খাটের শিয়রে এসে দাঁড়াল।

খাটের ওপরে অজর শুয়েছিল, চক্ষু দুটি তার মুদ্রিত, গলা অবধি লেপ দিয়ে ঢাকা। অনেকদিন কামানো হয়নি বলে মুখময় খোঁচা খোঁচা দাড়ি গোঁফ।

অজরের সেই শীর্ণ মুখ দেখেই শোভনার মনে হোলো যেন মৃত্যুর ছায়া তার সেই গৌরবর্ণ উজ্জ্বল মুখখানাকে মলিন কোরে ফেলেচে। হঠাৎ তার মনে বহুদিন বিস্মৃত মৃত পিতার সেই মুখখানা মনে পড়ে গেল। তার যেন কি রকম ভয়-ভয় করতে লাগ্‌ল। সে খাটের একটা কোণা চেপে ধরলে।

অজরের সেই নিস্পন্দ দেহ দেখতে দেখতে শোভনার মনে হোতে লাগ্‌ল—এও তো মৃত। তাই বুঝি ইন্দিরা ভয়ে কোনো প্রতিবাসীদের ঘরে গিয়ে আশ্রয় নিয়েচে। শোভনার মনে হোতে লাগ্‌ল—ছুটে পালিয়ে যাই। সে একবার ঘাড় ঘুরিয়ে দরজার দিকে তাকালে। সেখানে অন্ধকার—ঘন অন্ধকার। একবার যেন মনে হোলো সেই অন্ধকারে শাদা মতন কি একটা চলে বেড়াচ্ছে। সেটা বোধ হয় অজরের অশরীরি আত্মা। বেরুতে গেলেই সে যদি শোভনার পথ আটকায়। শোভনা কাঁপতে

শোভনা বল্লে—পরে লোকটা কোথায় গেল, সে বেঁচে রইল কি জলেই ডুবে মর্‌ল। তার খোঁজ করা উচিত ছিল। কোথায় গিয়েছে বলে সন্দেহ হয় আপনার ?

অজর হেসে বল্‌লে—আমার কোনো সন্দেহই হয় না। যাবার কিছুদিন আগে কলকাতায় যাবে বলেছিল।

শোভনা চুপ কোরে রইল। সমস্ত ব্যাপারটা তার কাছে মস্ত একটা প্রহেলিকার মতন ঠেক্‌ছিল।

অজর বল্‌লে—শোভনা, আমার বিয়েতে তুমি খুব উৎসাহী ছিলে, না ?

শোভনা এবারও কোনো উত্তর দিলে না। অজর বলতে আরম্ভ করলে—ফুলশয্যার রাত্রি থেকেই আমি বুঝতে পেরেছিলুম যে আমার সঙ্গে বিয়ে হওয়ায় সে সুখী হয় নি। ইন্দিরা হাবে ভাবে, কথায় ও কাজে নিশি দিন ঐ কথাই প্রকাশ কর্‌ত। কিন্তু আমি তো তাকে জোর করে বিয়ে করি নি। আমাকে তার ভাল না লাগলেও এমনভাবে তার যাওয়া উচিত হয় নি। কি বল শোভনা ?

শোভনা এবারও কোন উত্তর দিলে না। অজর জিজ্ঞাসা করলে—কি শোভনা কথা বল্‌চ না যে ?

শোভনা এবার বল্‌লে—পণ্ডিতমশাই আপনার সেবা করচে কে ?

অজর বল্‌লে—আমার ছেলেবেলার চাকর রামেশ্বর আছে। সেই আমার সেবা করে। তা ছাড়া ঝি আছে, সে-ও পুরোনো লোক। সন্ধ্যাবেলা সব এদিকে ওদিকে কাজে গেছে—এখুনি সব এসে হাজির হবে।

সেদিন শোভনা যখন অজরদের বাড়ী থেকে রাস্তায় বেরুল তখন অনেক রাত্রি। এখানে এসে অবধি এত রাত্রে সে কখনো রাস্তায় বেরোয় নি। অন্ধকার রাত্রে সে বিজন পথের মধ্যে একলা বাড়ী ফিরতে হয়ত

শোভনা অজরের মাথায় হাত দিয়ে বল্‌লে—এতো দিব্যি জ্বর এসেচে দেখ্‌চি!

অজর বল্‌লে—জ্বর এসেচে নাকি! কত জ্বর দেখ দিকিন্ একবার থার্ম্মোমিটারটা এনে!

শোভনা টেবিল থেকে থার্ম্মোমিটার এনে জ্বর দেখে বল্‌লে—একশো এক।

অজর ধীরে ধীরে বল্‌লে—আবার জ্বরটা এল। এবার বোধ হয় আর বাঁচবো না।

অজরের কণ্ঠস্বরে এমন একটা নিরাশার সুর বেজে উঠ্‌ল যে তা শুনে শোভনার চোখে জল দেখা দিল। এই নির্ব্বিরোধী স্নেহশীল অজর দিনে দিনে শোভনার হৃদয়ের অনেকখানি জায়গা অধিকার কোরে নিয়েছিল। শোভনার মনে হোতে লাগ্‌ল কি অসহায় অজর! তার চেয়েও ঢের বেশী অসহায়।

শোভনা ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করলে—কিছু কুপথ্য করেছিলেন নাকি?

অজর একটু হেসে বল্‌লে—পথ্যই পাই না তার আবার কুপথ্য আর সুপথ্য।

শোভনা রামেশ্বরকে ডেকে তক্ষুনি ডাক্তারের বাড়ীতে খবর দিতে বল্‌লে।

রামেশ্বর চলে যাবার পর অজর বল্‌লে—আজ সাতদিন ওষুধটা খাই নি। মনে করলুম বেশ তো সেরে উঠ্‌চি আর ওষুধ খাবার বোধ হয় দরকার হবে না।

শোভনা বল্‌লে—বড্ড অন্যায় করেচেন পণ্ডিত মশাই। ডাক্তার যত দিন না বারণ করচেন ততদিন ওষুধ খেতে হবে বৈকি?

অজর চুপ কোরে রইল। শোভনা আবার বল্‌লে—দেখুন তো,

শোভনা বলতে লাগ্‌ল—ঠিক সময়ে ওষুধ, ঠিক সময়ে পথ্য না পড়্‌ল অসুখ সারা যে মুস্কিল হবে। রুগীর কি আর ওষুধ খাবার কথা মনে থাকে!

অজয় বল্লে—তবু যদি আমার নিজের নড়বার ক্ষমতা থাকৃত তা হোলে কোনো লোকের সাহায্যই দরকার হোতো না। এতদিন তো একলাই কাটিয়েচি। এর মধ্যে অসুখ-বিসুখও হয়েচে কিন্তু আমি নিজেই নিজের সেবা করেচি। এবারকার রোগ যে আমায় একেবারে পঙ্গু কোরে ফেলেচে!

শোভনা চুপ কোরে রইল। অজয় একটু চুপ কোরে থেকে বল্লে—আর একলা সারাদিন চুপটী কোরে এই খাটে পড়ে থাকা—এ যে রোগ যন্ত্রণার চাইতেও বেশী। কি যে কষ্ট তা বোধ হয় তুমি একটু একটু বুঝতে পার, কারণ তোমায় একলা কাটাতে হয়।

শোভনা বল্লে—সামনেই আমাদের গ্রীষ্মের ছুটি। সে সময় আমি দিন রাত্রি এখানে এসে থাকৃব। আমার যে স্কুল রয়েচে পণ্ডিত মশাই, তা না হোলে কি আপনাকে এ রকম কষ্ট পেতে হয়?

অজয় শোভনার কথাগুলো শুনে অতি কষ্টে উঠে খাটে পিঠটা হেলান দিয়ে বল্লে—শোভনা, তোমায় একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—যদি অন্যায় হয় তা হোলে ক্ষমা কোরো। আমার ভার নেবে শোভনা? দেখ, সংসার করেছিলুম কিন্তু সংসারের যা সব চেয়ে বড় অভিশাপ তাই আমার মাথায় বাজের মতন এসে পড়্‌ল। তারপর এই ব্যাধি। এই ব্যাধি থেকে যদি কখনো সেরে উঠি তা হোলে আমায় বিয়ে করবে? দেখ—তোমায় আমি জানি—তুমিও আমায় জান—আমরা দু-জনেই বোধ হয় সুখী হতে পারব।

অজয় শোভনার মুখের দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে আবার শুয়ে

অজর জিজ্ঞাসা করলে—কে এল শোভনা ?

শোভনা বল্লে—বৌদি।

অজর বল্লে—কে ইন্দিরা ?

শোভনা বল্লে—হ্যাঁ।

অজর চোখ বুঁজিয়ে ফেল্লে।

কয়েক মিনিট এইভাবে কাটবার পর ইন্দিরা আবার ঘরের মধ্যে এসে একখানা চেয়ার টেনে অজরের খাটের ধারে বস্‌ল। সে শোভনার সঙ্গে একটি কথাও বল্‌লে না।

তিন জনের কারুর মুখেই কোনো কথা নেই। হঠাৎ শোভনা বলে উঠ্‌ল—পণ্ডিতমশাই, আজ তা হোলে যাই, অনেক রাত্রি হয়েচে।

অজর চমকে উঠে বল্‌লে—এঁ্যা যাবে ? আচ্ছা রামেশ্বরকে সঙ্গে নিয়ে যাও।

বিনা বাক্যব্যয়ে শোভনা নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেল।

বাড়ীতে বসে বসে শোভনা সেদিনকার সমস্ত ব্যাপারটা নিয়ে মনের মধ্যে আলোচনা করতে সুরু কোরে দিলে। ভাবতে ভাবতে সে নিজের কাছে নিজেই লজ্জিত হোয়ে পড়্তে লাগ্ল। তার মনে হোতে লাগ্ল—কোন্ মুখ নিয়ে আবার সে লোক সমাজে বেরুবে। তারপরে লজ্জার প্রথম তরঙ্গ কেটে গেলে সে বিচার কোরে দেখলে যে, এ বিষয়ে তার তো লজ্জার কিছুই নেই। অজর যাই বলে থাকুক না কেন সে তো তার উত্তরে কিছুই বলে নি। ব্যাপারটাকে সে খুব হাল্কাভাবে নেবার চেষ্টা করতে লাগ্ল। এইভাবে আরও কিছুদিন কাটবার পরে সে তার মনের সহজগতি ফিরিয়ে পেল।

একদিন বিকেলে শোভনা মন বেঁধে অজরদের বাড়ীর দিকে বেরিয়ে পড়্ল। সে গিয়ে দেখলে অজর বারান্দায় ইজিচেয়ারে একলা বসে রয়েচে। অজর তাকে দেখেই জিজ্ঞাসা করলে—কি শোভনা এ ক'দিন সেই থেকে তোমায় আর দেখিনা যে?

অজরের কথার ইঙ্গিতে শোভনার মুখ লজ্জায় লাল হোয়ে উঠ্ল। সে পেছন ফিরে একটা চেয়ার টেনে এনে বসতে বসতে বল্লে—ক'দিন ভারি কাজের তাড়া পড়েছিল—বৌদি কোথায়?

অজর বল্লে—ইন্দিরা দুপুরে সমরদের বাড়ী গিয়েছে, সন্ধ্যার আগেই আসবে বলে গেছে।

শোভনা অত্যন্ত সহজভাবে জিজ্ঞাসা করলে—বৌদি এতদিন কোথায় ছিলেন?

অজর বল্লে—তা তো জানি না।

তারপর একটু মৌন থেকে বল্লে—আমিও জিজ্ঞাসা করিনি আর সেও কিছু বলেনি। কেন বল তো?

অজরের এই শেষের প্রশ্নে শোভনা বিব্রত হোয়ে পড়্ল। সে কোনো

ইন্দিরার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে ওর মনে হোতে লাগ্‌ল আশ্চর্য্য রহস্যময়ী এই নারী। এর কিছুই কি বোঝবার উপায় নেই। সে ভাবতে লাগ্‌ল কেন ইন্দিরা কলকাতায় যাচ্ছে! সেখানে নিশ্চয় তার কোনো ভালবাসার পাত্র আছে। তারই সঙ্গে দেখা করবার জন্য সে এত ঘন ঘন কলকাতায় যায়। সেই যে চার পাঁচ মাস সে অদৃশ্য হয়েছিল—সে সময়টা নিশ্চয়ই ইন্দিরা তার কাছেই কাটিয়েছে। কথাটা মনে হোতেই শোভনার অজরের কথা মনে হোলো, সঙ্গে সঙ্গে সেই রাত্রের কথা—ইন্দিরার ওপর রাগ ও ঘৃণায় তার মনটা বিষিয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল।

হঠাৎ গাড়ীর মধ্যে মুখ ফিরিয়েই ইন্দিরা শোভনার দিকে তাকালে। শোভনা দেখলে তার দুই চোখে অশ্রু টলটল করচে। ইন্দিরা জিজ্ঞাসা করলে—আচ্ছা আপনাদের দেশ কোথায়?

শোভনা বল্লে—আমাদের দেশ ছিল বর্দ্ধমানের কোন্ এক জায়গায়। বাবা দেশ ছেড়ে দিয়ে কলকাতাতেই বাস করতেন। আমার জন্ম কর্ম্ম সবই কলকাতায়। দেশ কখনো চোখেও দেখিনি, সেখানকার কারুকে চিনিও না।

ইন্দিরা চুপ কোরে রইল। একটু পরে শোভনা জিজ্ঞাসা করলে—আপনাদের দেশ কোথায়?

ইন্দিরা বল্লে—কলকাতায়। তিন চার পুরুষ আগে অন্য কোথাও ছিল নিশ্চয়।

কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটবার পর ইন্দিরা বল্লে—কে জান্‌ত যে আমাদের জীবন ঐ পাড়াগাঁয়ে এমন ভাবে কাটবে।

কথাটা শুনে শোভনার এক সঙ্গে অনেক কথাই মনে পড়্‌তে লাগ্‌ল। তার বাবা-মার কথা, রমেশের কথা, স্কুল কলেজের কথা। সঙ্গে সঙ্গে ইন্দিরার প্রতিও সহানুভূতিতে ধীরে ধীরে তার মনটা আর্দ্র হোয়ে

উঠ্‌তে লাগ্‌ল। যখন হাওড়া ষ্টেশনে গাড়ী থামিল, তখন ট্রেণ থেকে নেমে ইন্দিরা শোভনাকে জিজ্ঞাসা করলে—আপনি কোন্ দিকে যাবেন ?

শোভনা মনে করেছিল যে ইন্দিরা যেখানে যাচ্ছে তাকেও সেখানে নিয়ে যাবে। কিন্তু সেদিক থেকে কোনো আমন্ত্রণ না আসায় সে একটু বিব্রত হোয়ে পড়্‌ল।

শোভনাকে নীরব দেখে ইন্দিরা একটু একটু কোরে অগ্রসর হোতে লাগ্‌ল। শোভনাও ধীরে ধীরে তার সঙ্গে এগিয়ে চল্‌ল। ষ্টেশন পার হোয়ে তারা গাড়ীর আড্ডার কাছে এসে দাঁড়াল। ইন্দিরা আবার জিজ্ঞাসা করলে—কোন্‌দিকে যাবেন ?

শোভনা এবার বল্লে—আমি একবার মার্কেটে যাব—সেখানে কতক-গুলো জিনিষ কিন্‌তে হবে। সেখান থেকে বালীগঞ্জে যাব একটী বন্ধুর বাড়ীতে।

ট্যাক্সির ভেঁপু ও গাড়োয়ানদের চীৎকারে সেখানে ভীষণ একটা হট্টগোল চলেছিল। ইন্দিরা একবার বিরক্তিপূর্ণ দৃষ্টিতে চারিদিকে চেয়ে একটা ট্যাক্সিতে উঠে বস্‌ল। তারপর মুখ বাড়িয়ে শোভনাকে বল্লে—সাতটা বাইশ মিনিটে গাড়ী, আমি সওয়া সাতটা নাগাদ ষ্টেশনে এসে পৌছব।

তার পর ট্যাক্সিচালককে হুকুম দিলে—যাও। ভোঁ কোরে গাড়ী-খানা সামনের দিকে ছুটে চলে গেল আর শোভনা হতভম্বের মতন দাঁড়িয়ে রইল।

শোভনা দেখলে ইন্দিরার গাড়ীখানা হাওড়া পুলের ওপরে গিয়ে উঠ্‌ল। সে যে এমন ভাবে তাকে একলা ফেলে যাবে এ কথা শোভনার একবারও মনে হয় নি। ইন্দিরার গাড়ীখানা অদৃশ্য হোয়ে যেতেই তার মনে

শোভনা হেসে ফেলে বল্লে—আমি তো তাই মনে করেছিলুম। কৈ কখনো তো আসেন না। যাক্ Better late than never.

ইন্দিরা বল্লে—একটু স্বার্থও আছে, একেবারে নিঃস্বার্থভাবে আসিনি।

শোভনা একটু আশ্চর্য্য হয়ে গেল। সে বল্লে—কি স্বার্থ বলুন দিকিনি?

ইন্দিরা বল্লে—কাল আমি কলকাতায় যাচ্ছি। আপনি যাবেন?

শোভনা বল্লে—আমি যে দেওঘরে যাবার ঠিক করছি।

ইন্দিরা গম্ভীর হোয়ে বল্লে—ও তাই নাকি! কবে যাবেন?

শোভনা বল্লে—যাই তো কাল পরশু নাগাদ রওনা হব।

ইন্দিরা সেই রকম গম্ভীর হোয়েই জিজ্ঞাসা করলে—কবে ফিরবেন?

শোভনা বল্লে—গরমের ছুটিটা সেইখানেই কাটিয়ে আস্‌ব মনে করছি।

ইন্দিরা আবার কিছুক্ষণ গম্ভীর হোয়ে বসে থেকে বল্লে—দেখুন আজ আপনার কাছে এসেছি কতকগুলো কথা জিজ্ঞাসা করতে। কিন্তু তার আগে আপনাকে প্রতিজ্ঞা করতে হবে সে কথা আর কারুকে আপনি বলবেন না।

ইন্দিরার কথাবার্ত্তা শুনে শোভনা দস্তুর মতন ভড়কে গেল। কি এমন গোপনীয় কথা সে তাকে জিজ্ঞাসা করতে পারে মনের মধ্যে তাই তোলাপাড়া করতে লাগ্‌ল।

তাকে চুপ কোরে থাক্‌তে দেখে ইন্দিরা একটু হেসে বল্লে—তবে কি আমি বুঝব যে আপনি আমার কথাগুলো গোপন রাখতে পারবেন না।

ইন্দিরার কথা শুনে শোভনার চমক ভাঙ্‌ল। সে বলে উঠ্‌ল—না না—তা কেন?

করতে চায় যে, স্বামী অন্য স্ত্রীতে অনুরক্তা হোক তা সে গ্রাহ্য করে না। অতি দুর্দ্দিনেও সে সম্ভ্রমের উচ্চশিখরে দাঁড়িয়ে জানাতে চায় যে তোমাদের চেয়ে আমি এখনো অনেক ওপরে—তোমাদের নিক্ষিপ্ত কর্দ্দম আমার অঙ্গে পৌঁছবে না।

শোভনা একদৃষ্টে ইন্দিরার মুখের দিকে চেয়ে রইল। তাকে দেখতে দেখতে তার আবার মনে হোলো ইন্দিরা সত্যিই সুন্দরী। শোভনার ইচ্ছা হোতে লাগ্‌ল ইন্দিরার দুই গালে দুই চুমু দিয়ে বলে যে, কোনো ভয় নেই তোমার—আমার দ্বারা তোমার কোনো ক্ষতি হবে না—আমাকে বিশ্বাস কর।

ইন্দিরা ঘাড় নীচু কোরে বসে কি যেন ভাবতে লাগ্‌ল। কিছুক্ষণ পরে শোভনা হেসে বল্লে—বৌদি আপনার কোনো ভয় নেই, আপনার রত্নটিকে কেড়ে নেবার কোনো মতলব আমি করিনি।

ইন্দিরা যেন কিসের স্বপ্নে বিভোর হোয়ে বসেছিল। শোভনার কথাগুলো কাণে যেতেই সে চম্‌কে উঠে বল্লে—এঁ্যা!

তারপরে একটু হেসে ইন্দিরা আবার ঘাড় নীচু করলে—অতি ম্লান হাসি সে।

দ্বিপ্রহরের জ্বলন্ত সূর্য্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়্‌ল। নদীর ধারের জান্‌লাটা দিয়ে খানিকটা রোদ এসে ইন্দিরার গায়ের ওপরে পড়্‌তেই শোভনা উঠে গিয়ে জান্‌লাটা বন্ধ কোরে দিলে।

আবার নিস্তব্ধ, কারুর মুখে কোন কথা নেই। শোভনার অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ হোতে লাগ্‌ল। ইন্দিরার হাবভাব ও মুখ দেখে সে বুঝতে পারলে সে যেন তাকে আরও কিছু জিজ্ঞাসা করতে চায়। কি কথা জিজ্ঞাসা করতে চায় সে! কৌতূহলের সঙ্গে সঙ্গে শোভনার ভয় হোতে লাগ্‌ল।

ইন্দিরা আর কোনো কথা না বলে চুপ কোরে বসে রইল। কিছুক্ষণ এইভাবে কাটবার পর শোভনা উঠে গিয়ে পাশ্চিম দিকের জানালাটা খুলে দিলে। সূর্য্য তখন দিগন্তে একেবারে ঢলে পড়েছে। অস্তমান সূর্য্যের একটুখানি লাল আভা শোভনার ঘরের মধ্যে এসে পড়্ল।

শোভনা জিজ্ঞাসা করলে—কবে কলকাতা থেকে ফিরবেন ?

ইন্দিরা বল্লে—শীগ্‌গীরই ফির্‌ব।

ইন্দিরার মনটাকে একটু সুখী করবার জন্য শোভনা বল্লে—আপনার সঙ্গে কলকাতায় যেতে বড় ইচ্ছা কর্‌ছে কিন্তু দেওঘরে যাবার ব্যবস্থা যে কোরে ফেলেছি। আবার যখন যাবেন তখন নিশ্চয় সঙ্গে যাব।

ইন্দিরা কিছুক্ষণ চুপ কোরে থেকে বল্লে—আর বোধ হয় আমি কলকাতায় যাব না।

শোভনা দেখলে যে দু-ফোঁটা জল এতক্ষণ ইন্দিরার দুই চোখে টল্ টল্ করছিল সে দু-ফোঁটা তার চোখ উপ্‌চে গালে ঝরে পড়েছে।

ইন্দিরাকে কাঁদতে দেখে শোভনার বড় দুঃখ হোলো। কিন্তু কি সহানুভূতি জানাবে সে ? কিসের দুঃখ তার কিছুই সে জানে না। সে বিষণ্ণমুখে ইন্দিরার মুখের দিকে চেয়ে বসে রইল আর ইন্দিরার দুই গাল বয়ে নিঃশব্দে ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু ঝরে পড়্‌তে লাগ্‌ল।

সন্ধ্যার অন্ধকার ধীরে ধীরে ঘরের মধ্যে ঘনিয়ে উঠ্‌ল। ওপারের কলগুলো কিছুক্ষণ ধরে একঘেয়ে একটানা সুরে ছুটীর বাঁশী দিয়ে চুপ কর্‌লে। নিস্তব্ধ সেই সন্ধ্যাবেলায় নদীর ধারের সেই ঘরটীতে বসে একটী নারী নিঃশব্দে তার বুকের ব্যথা ঝরিয়ে দিতে লাগ্‌ল আর একটি নারী মৌন বিস্ময়ে তার মুখের দিকে চেয়ে বসে রইল।

অনেকক্ষণ এইভাবে কাটবার পর শোভনা তার ঝিকে ডেকে ঘরের

ভালবাসে। ইন্দিরা বিয়ের দিন থেকেই শোভনার নাম শুনেছে। এমনও হোতে পারে যে তখন থেকেই তার মনে স্বামীর প্রতি সন্দেহের বীজ রোপিত হয়েছে। তার পরে শোভনা নিত্য তাদের বাড়ীতে গিয়েছে। ইন্দিরা তার প্রতি অবহেলার ভাব দেখিয়েছে তা সত্ত্বেও সে তাদের বাড়ীতে যাওয়া বন্ধ করেনি। এতে তার সন্দেহ দিনে দিনে বেড়েই উঠেছে। এই নিয়ে তাদের স্বামী-স্ত্রীতে মনান্তরও হয়েছে নিশ্চয়! তার পরে সেই রাত্রি! যেদিন অজয় তাকে বিয়ের প্রস্তাব করেছিল—সেই মুহূর্ত্তেই ইন্দিরার আবির্ভাব! অজয় যে তার হাত ধরেছিল তা বোধ হয় ইন্দিরার দৃষ্টি এড়ায় নি। সর্ব্বনাশ! এই সামান্য কথাটা এতদিন সে বুঝতে পারে নি কেন?

শোভনা স্পষ্ট বুঝতে পারলে স্বামীর পর অভিমান কোরেই ইন্দিরা চলে গিয়েছিল ও এখনও চলে যেতে চায়। ইন্দিরার অশ্রুজলের উৎস যে কোথায় এতক্ষণে শোভনার মনে সেটা জ্বল্‌জ্বল্ কোরে ফুটে উঠ্‌ল। তার মনে হোতে লাগ্‌ল যে এতদিন কেন এই কথাটা তার মনে হয়নি। ছি ছি ছি ছি—শোভনার মাথা ঠুকে মরে যেতে ইচ্ছা করতে লাগ্‌ল।

শোভনা ভাবতে লাগ্‌ল নিজের অনিচ্ছাসত্ত্বেও এই যে একটি পরিবারের সর্ব্বনাশ করতে বসেছে এ থেকে কি কোরে সে তাদের রক্ষা করবে। সে তখুনি স্থির কোরে ফেল্লে যে, সে-ই তাদের চোখের সামনে থেকে দূরে চলে যাবে। দেওঘরে তারা এখনো উপযুক্ত লোক পায় নি। সেখানে গিয়ে আবার সে চাকরী নেবে। সেখানে যদি চাকরী না জোটে তবুও সে ফিরে আস্‌বে না। এই ক'বছরে তার কয়েক শো টাকা জমেছিল সেই টাকায় তার কিছুদিন চল্‌বে। ততদিনে অন্য কোনো জায়গায় চাকরী জুটিয়ে নিতে পারবে।

শোভনা ভাবতে লাগ্‌ল, যাবার আগে অজয়কে কি একখানা চিঠি

দারোয়ান এসে দাঁড়াল। শোভনা একটু ভেবে তাকে বল্লে—একবার ষ্টেশনে গিয়ে জিজ্ঞাসা কোরে এস যে দেওঘরে যাবার গাড়ী কখন পাওয়া যাবে।

দারোয়ান চলে গেল। কিছুক্ষণ বাক্স গোছাবার পর শোভনা ক্লান্ত হোয়ে আরাম কেদারায় গা ঢেলে দিলে। কাল সারারাত্রি প্রায় অনিদ্রায় কেটেছে; মনের অবসাদ ও দেহের ক্লান্তিতে শরীর তার ভেঙ্গে পড়্ছিল। সে তাড়াতাড়ি স্নান সেরে সামান্য কিছু খেয়ে বিছানায় শুয়ে পড়্ল।

দারোয়ান এসে খবর দিলে যে দিনের বেলায় নটার সময় একটা গাড়ী আছে সেটা গিয়ে সন্ধ্যের সময় যশিডিতে পৌছায়, আর রাত্রি আটটায় একটা ছাড়ে সেটা গিয়ে পৌছায় শেষ রাত্রে।

শোভনা স্থির করলে সে দিনের গাড়ীতেই যাবে। তারপরে রেলের স্বপ্ন দেখতে দেখতে সে ঘুমের কোলে ঢলে পড়্ল।

শোভনার যখন ঘুম ভাঙ্ল তখন বেলা পড়ে গিয়েছে। দেহের ক্লান্তি দূর হয়েছে বটে কিন্তু মনের মধ্যে কি যেন একটা গুরুভার চেপে রয়েছে। ঘুম থেকে উঠেই সে ভাবতে লাগল আর কোন কাজ বাকী আছে কিনা। ঘরের জানালাগুলোয় সে নিজের হাতে তৈরী করা সুন্দর পর্দ্দা লাগিয়েছিল। সেগুলোর দিকে চোখ পড়তেই তার মনে হোলো পর্দ্দাগুলো খুলে নিয়ে যেতে হবে। একটু পরেই আবার তার মনে হোতে লাগল না থাক, এঘরে তবুও তার কিছু চিহ্ন থাক।

টেবিলের ওপরে চোখ পড়তেই শোভনা দেখলে খান তিনেক মাসিক পত্র ডাকে এসেছে। সে ভাবলে, কাল দুপুরটা রেলে তবুও খানিকটা সময় কাগজ নিয়ে কাটানো যাবে। বিছানা থেকে উঠে একখানা কাগজ নিয়ে আবার এসে সে শুয়ে পড়্ল।

কাগজখানার মোড়ক ছিঁড়ে পাতা উল্টেই শোভনা দেখলে প্রথমেই

দাঁড়িয়ে অভিনন্দন-লিপি পড়্ছে। অভিনন্দনের উত্তরে সে কি বল্বে তাই সে মনে মনে আবৃত্তি কর্তে লাগ্ল। এক জায়গায় একটা কথা আট্কে যেতেই তার চমক ফিরে এল। নিজের ছেলেমানুষীতে সে নিজেই হেসে ফেল্লে।

ঝি এসে খাবার কথা জানাতে শোভনা খেয়ে এসে বিছানায় শুয়ে পড়্ল।

শুয়ে শুয়ে সে হিসাব করতে লাগ্ল—আজ রাতে যদি চিঠিখানা না যায় তা হোলে কাল বেলা দশটার মধ্যে সেখানা কলকাতায় যাবেই। রমেশের কাছে চিঠি পৌঁছতে সেই তিনটে কি চারটে। সেই দিনই সে যদি জবাব দেয় তা হোলে পরশু সে চিঠি পাওয়া যাবে। কিন্তু চিঠি পেয়েই কি রমেশ জবাব দেবে? সে কাজের লোক, হয়তো দু-তিন দিন পরে উত্তর দেবে। যা হোক্, রমেশ যদি উত্তর দেয় তা হোলে আজ থেকে এক সপ্তাহের মধ্যেই সে তা পাবে। শোভনার মনে হোতে লাগ্ল আজ থেকে সাত দিনের মধ্যেই তার জীবনের ভবিষ্যৎ পথ নির্দ্দিষ্ট হোয়ে যাবে। তারপর নানারকম সম্ভব ও অসম্ভব চিন্তা একটার পর একটা এসে তার মনের দরজায় ভিড় কোরে দাঁড়াতে লাগল। কত প্রশ্নের সমাধান হোয়ে গেল, কত প্রশ্নের সমাধান হবার আগেই অন্য প্রশ্ন জোর কোরে ঢুকে পড়্ল। সুখ দুঃখ, ভয় বিস্ময়, আশা নিরাশার দোলায় দোল খেতে খেতে সে বিপর্য্যস্ত হোয়ে পড়্তে লাগ্ল। এরি মধ্যে কখন্ সুষুপ্তি এসে তার সর্ব্বাঙ্গে স্নেহের পরশ বুলিয়ে দিয়ে চলে গেল।

পরের দিন ঘুম থেকে উঠে শোভনার মনের মেঘ অনেকখানি কেটে গেল। প্রবল ঝড় বৃষ্টির পরে প্রকৃতি যেমন শান্ত হয় তার মনের অবস্থাও বর্ষণ ক্লান্ত প্রকৃতির মত ক্ষান্ত হোয়ে পড়েছিল। শোভনার

সে দিনটা শোভনার আর যেন কাটতে চায় না। অনেক কষ্টে বিকেল অবধি ঘরের মধ্যে ছটফট্ কোরে শেষকালে সে বেরিয়ে পড়ল। বাড়ী থেকে বেরিয়েই তার মনে হোলো অজরের সঙ্গে একবার দেখা করে আসি। এই দু দিনে শোভনার মনে যে সংসারের বিরুদ্ধে বিশ্বজোড়া অভিমান ঘনিয়ে উঠেছিল, রমেশের চিঠি পেয়ে তার মনের সে অভিমান দূর হোয়ে গিয়েছিলো। কল্পনায় সে অদূর ভবিষ্যতের রঙিন ছবি তৈরি করছিল এখানকার এই সব ক্ষুদ্রতার সেখানে কোনো স্থান নেই। রমেশ যদি তাকে গ্রহণ করে তা হোলে তো কথাই নাই। আর ভবিতব্য যদি তার অদৃষ্টে অন্য কথা লিখে থাকে তা হোলে সে দেওঘরে চলে যাবে। অজর তো তার কোন অনিষ্টই করে নি।

অজরের বাড়ীতে গিয়ে শোভনা দেখলে যে সে একখানা ইংরেজী বই পড়্ছে। সে বল্লে—পণ্ডিত মশাই যে অনেকখানি উন্নতি করেছেন দেখচি!

অজর বইখানা মুড়ে রেখে বল্লে—তোমরা তো আর আমায় পড়ালে না।

শোভনা হাস্তে হাস্তে বল্লে—যা পড়ান পড়েছিলেন তাতে তো আমাদের ভয় হয়েছিল। উঠেছেন এই আমাদের ভাগ্যি। এখন কেমন আছেন পণ্ডিত মশাই?

অজর বল্লে—এখন তো ভালই আছি। আচ্ছা শোভনা! তোমায় একটা কথা জিজ্ঞাসা করি,—তুমি আমায় পণ্ডিত মশাই বল কেন?

শোভনা বল্লে—তবে কি বলব?

অজর বল্লে—কেন দাদা বল্তে পার কিংবা যা খুসী বল্তে পার। পণ্ডিত মশাই তো নই আমি।

শোভনা বল্লে—বেশ, দাদাই বল্‌ব। কিন্তু হঠাৎ দাদা বলতে আরম্ভ করলে বৌদি হাঙ্গামা বাধাবে না তো?

শোভনার চোখে মুখে একটা দুষ্টু হাসি খেলে গেল। অজয় কোনো কথা না বলে শোভনার দিকে চেয়ে রইল।

শোভনা জিজ্ঞাসা কর্‌লে—কি দেখছেন অমন কোরে?

অজয় একটু হেসে বল্লে—তোমাকে আজ ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে শোভনা!

শোভনার মুখখানা লজ্জায় লাল হোয়ে উঠ্‌ল। কিন্তু তখুনি সে বল্লে,—কেন আমি কি কুৎসিত যে অন্য দিন আমায় বিশ্রী দেখায়!

অজয় বল্লে—এমন কথা যে বলে তার চেয়ে বড় মিথ্যেবাদী আর নাই।

শোভনা যেন কিছুই জানে না এম্‌নি একটা ভাব দেখিয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—বৌদি কোথায়?

অজয়ের হাসি মুখ এক মুহূর্ত্তেই বিষণ্ণ হোয়ে পড়্‌ল। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সে বল্লে কলকাতায় গেছে।

আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে অজয় হঠাৎ বলে ফেল্লে—জান শোভনা, ইন্দিরা জিজ্ঞাসা করছিল আমি তোমায় ভালবাসি কিনা—

শোভনা স্তম্ভিত হওয়ার অভিনয় কোরে অজয়ের মুখের দিকে চেয়ে রইল। তার ভয় হোতে লাগ্‌ল এক্ষুনি সে হো হো কোরে হেসে ফেলবে! সে যে অজয়ের চেয়ে অনেক বেশী জানে সে কথা প্রকাশ করবার জন্য তার ভয়ানক ইচ্ছা করতে লাগ্‌ল। কিন্তু প্রাণপণ শক্তিতে সে ইচ্ছাকে রোধ করে সে বসে রইল।

অজয় এবার একটু হেসে বল্লে—আমি ইন্দিরাকে কি বলেছি জান?

অজরের বাড়ী থেকে ফিরে খেয়ে দেয়ে শোভনা শুয়ে পড়্ল। ছোট্ট মেয়ে পরের দিন সকালবেলা ভাল পুতুল পাবে শুনে যেমন আশা ও উৎকণ্ঠা জড়িত মনে ঘুমের কোলে ঢলে পড়ে, শোভনাও তেমনি আশা ও উৎকণ্ঠার দোলায় দোল খেতে খেতে ঘুমিয়ে পড়্ল।

পরে তার সঙ্গে পরিচয় যত ঘনিষ্ঠ হোতে লাগ্‌ল, ইন্দিরার রহস্য যেন তত গাঢ়তর হোয়ে উঠ্‌ছিল। কিন্তু ইন্দিরার আজকের এই উক্তি শোভনার সকল বিস্ময়কে ছাড়িয়ে উঠ্‌ল। সে কিছুক্ষণ নির্ব্বাক বিস্ময়ে ইন্দিরার মুখের দিকে চেয়ে থেকে আস্তে আস্তে বল্লে—আচ্ছা আমি যাই, মুটেটা দাঁড়িয়ে রয়েছে।

ইন্দিরা কোনো কথা না বলে দু-হাত তুলে তাকে নমস্কার করলে।

শোভনা তাড়াতাড়ি ষ্টেশনের বাইরে এসে একখানা ট্যাক্সি কোরে হোটেলে গিয়ে উপস্থিত হোলো। হোটেলের মালিক এক শ্বেতাঙ্গী রমণী। বয়সে সে বৃদ্ধা কিন্তু যৌবন যে তার ঝড়ের মধ্যে দিয়ে কেটেছে এ বয়সেও তার চিহ্ন বর্ত্তমান। শোভনার জন্য ঘর নির্দ্দিষ্ট ছিল। বৃদ্ধা তাকে সেই ঘরে নিয়ে গেল।

শোভনা তাকে বল্লে—ঘরেই আমার খাবার দিয়ে যেতে বলুন—আমি এখুনি বেরুব।

বৃদ্ধা চলে যাবার কিছু পরেই চাকরে খাবার নিয়ে এল। খাওয়া শেষ কোরে সে ঘড়ি দেখলে বারোটা বেজে গেছে। সে তাড়াতাড়ি পোষাক বদলে হোটেল থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সিতে চড়ে মিউজিয়ামের দিকে রওনা হোলো।

মিউজিয়ামে প্রত্নবিভাগের ঘরে ঢুকে শোভনা একটা পাথরের ভাঙা মূর্ত্তির সামনে গিয়ে দাঁড়াল। তখনো সে সন্দেহের দোলায় দোল খাচ্ছিল। তার মনে হোতে লাগ্‌ল হয়ত রমেশ তার চিঠি পায়নি, কিংবা হয়ত এ সময় তার আসবার সুবিধা হবে না।

ঘরের মধ্যে কিছুক্ষণ পায়চারি কোরে শোভনা হাতঘড়ির দিকে চেয়ে দেখলে দেড়টা বেজে গেছে। তার মনে হোতে লাগ্‌ল রমেশ বুঝি আর এল না। রমেশকে সে যা লিখেছিল মনে মনে সেই কথাগুলো আবৃত্তি

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে তার লজ্জা হোতে লাগ্‌ল। হাতের চুড়িগুলো খুলে ফেলে সে দু-গাছা সরু গোল বালা পরলে। তার মা মারা যাবার আগে তার জন্য হাল ফ্যাসানের গোল তাগা তৈরি করিয়েছিলেন—এতদিন শোভনা সে তাগা ব্যবহার করেনি। একগাছা তাগা বের কোরে সে বাঁ হাতের বাহুতে পরলে। তাগা পরবার সময় শোভনা বুঝতে পারলে এত দুঃখেও সে আগের চেয়ে অনেক মোটা হোয়ে পড়েছে, কারণ তাগা যখন তৈরি হয় তখন সেগুলো তার বাহুর চাইতে বড়ই ছিল। তার সুগোল গৌর হাতে সে তাগা এঁটে বসে রইল।

বেশ বিন্যাস শেষ কোরে সে লম্বা আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। আয়নায় নিজের প্রতিবিম্ব দেখে শোভনার মনে হোলো—যৌবন এখনো তার দেহ থেকে বিদায় নেয় নি। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সজ্জার মধ্যে কোথায় কি খুঁৎ আছে তাই আবিষ্কার করবার চেষ্টা করতে লাগ্‌ল।

সাতটা বাজবার কয়েক মিনিট পরেই হোটেলের বেয়ারা রমেশের কার্ড নিয়ে এসে শোভনাকে দিয়ে বল্লে—সাহেব অপেক্ষা করছেন।

শোভনা কার্ড পড়ে বল্লে—সাহেবকে সেলাম দাও।

বেয়ারাকে বিদায় কোরে আর একবার সে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চট কোরে নিজেকে দেখে নিয়ে ফিরে এসে একখানা চেয়ারে বসে পড়্‌ল।

রমেশ ঘরে ঢুকেই বল্লে—এই যে শোভনা, একেবারে তৈরি।

রমেশ ডিনারের পোষাক পরে এসেছিল। শোভনা অবাক হোয়ে তার অপরূপ পোষাক দেখতে লাগ্‌ল।

রমেশ বল্লে—শোভনা, ডিনারের এখনো দেরী আছে। চল ততক্ষণ আমরা মোটরে কোরে একটু বেড়িয়ে নিই।

রমেশের আহ্বানে শোভনা উঠ্‌ল না, সে যেমন বসেছিল তেমনিই

বসে রইল। প্রথম থেকেই রমেশের ব্যবহারের মধ্যে সে কি যেন একটা অভাব বোধ করছিল। সেই অভাবটা এবার অত্যন্ত তীক্ষ্ণ হোয়ে তার অন্তরে নির্দ্দয়রূপে আঘাত করতে আরম্ভ কোরে দিল। শোভনার মনে হোতে লাগ্‌ল কে যেন তার হাত ধরে কোন এক বন্ধুর পথে ছুটে চলেছে। যে তাকে এমন ভাবে আকর্ষণ করছে তাকে সে চেনে না, যে পথে সে পা বাড়িয়েছে সে পথও তার অজ্ঞাত। এতক্ষণ যে উৎসাহে সে বেশ বিন্যাস করছিল, হঠাৎ কে যেন তার সমস্ত উৎসাহ শুষে নিয়ে চলে গেল।

শোভনাকে চুপ কোরে থাকতে দেখে রমেশ এগিয়ে এসে তার একখানা হাত ধরে জিজ্ঞাসা করলে—কি হয়েছে তোমার শোভনা! অসুখ কর্‌চে?

শোভনার বুকের মধ্যে কান্না গুম্‌রে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। কিন্তু পাছে রমেশ তার চোখে অশ্রু দেখে এই ভয়ে সে চেয়ার ছেড়ে উঠে বল্লে—না চল।

রমেশ ও শোভনা নেমে এসে রাস্তায় দাঁড়াল। দরজার সামনেই রমেশের প্রকাণ্ড মোটর গাড়ী দাঁড়িয়েছিল। রমেশ এগিয়ে এসে মোটরের দরজা খুলে শোভনাকে গাড়ীতে উঠিয়ে নিজে তার পাশে বসে শোফারকে বল্লে—চল ময়দান।

একটু পরেই মোটরখানা মাঠের আঁকা বাঁকা রাস্তায় পড়ে ছুটতে লাগ্‌ল। রাতের কলকাতার এ মূর্ত্তি শোভনা কখনো চোখে দেখে নি। অন্ধকারের ভেতর দিয়ে দূরে সারি সারি আলোর থাম দেখা যাচ্ছে। মাঝে মাঝে একটা মোটর তাদের পাশ দিয়ে বিদ্যুৎ বেগে বেরিয়ে যাচ্ছে। শোভনার দমে-যাওয়া মনটা আবার একটু একটু কোরে চাঙ্গা হোয়ে উঠতে আরম্ভ করলে।

রমেশ জিজ্ঞাসা করলে—শোভনা রাত্রে কখন খাও?

শোভনা একটু দুষ্টু হাসি হেসে বল্লে—সে কিন্তু তোমার সঙ্গে আলাপ করবার জন্য ভারি ব্যস্ত। আমার মনে হয় সে তোমাকে মনে মনে ভালবসে।

রমেশ বলে উঠ্‌ল—বল কি। কবে আলাপ করিয়ে দেবে ?

শোভনা তার গেলাসটা তুলে গেলাসের মধ্যে দিয়ে রমেশকে দেখতে লাগ্‌ল।

রমেশ বল্লে—বল না কবে আলাপ করিয়ে দেবে ?

—যবে বল্‌বে।

রমেশ বল্লে—আমি ভবিষ্যদ্বাণী করছি পরে সে একজন উঁচুদরের লেখিকা হোয়ে উঠবে। একথা তাকে বোলো বুঝলে।

রমেশের হঠাৎ এই মত পরিবর্ত্তন হওয়ায় শোভনা কৌতুক অনুভব করলে। হাসি চাপতে না পেরে সে হো হো কোরে হেসে উঠ্‌ল। হাসি আর থামে না। শেষ কালে রমেশ তার কাছে গিয়ে বল্লে—চল আমরা ওপরে গিয়ে বসি। তারপরে একটু হাওয়া-টাওয়া খেয়ে ফেরা যাবে।

শোভনা তার হাত দুটো লম্বা কোরে রমেশের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বল্লে—উঠ্‌তে পারচি না যে!

রমেশ তার হাত দু-খানা ধরে তুলতে গিয়ে নিজেই টলে পড়তে শোভনা আবার হো হো কোরে হেসে উঠ্‌ল।

তার পরে এগিয়ে এসে শোভনার হাত দু-খানা ধরে টেনে তুল্লে। শোভনা দাঁড়িয়েই টলে পড়ে যাচ্ছিল কিন্তু রমেশ তার কোমরটা জড়িয়ে ধরে তাকে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

শোভনা ও রমেশ এ-ওর গায়ে টলে পড়্‌তে পড়্‌তে একটা কার্পেট পাতা চাওড়া সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠ্‌ল। তারপরে রমেশ তাকে নিয়ে

গান গাইতে গাইতে পুরোনো দিনের স্মৃতিগুলো শোভনার মনের মধ্যে একে একে এসে ভিড় জমাতে আরম্ভ করলে। ছাতের কোণে সেই নিরালা কোণটীতে কত জ্যোৎস্নারাতে শোভনা গুণ্ গুণ্ কোরে এই গান রমেশকে শুনিয়েছে। এই ক'বছরের রুদ্ধ অশ্রু সুরের রূপে যেন তার দয়িতের পায়ে সে ঝরিয়ে দিতে লাগ্‌ল। একবার তার মনে হোলো যেন পিয়ানোটা তার গলার সঙ্গে ঠিক মিল্‌চে না। গানের কথাগুলো যেন সব এলোমেলো হোয়ে যাচ্ছে। তখুনি তার মনে হোলো গলা দিয়ে যেন আওয়াজই বেরুচ্ছে না, তারপরই কে যেন তাকে কোলে কোরে তুলে ফেল্লে। তার একখানা হাত যেন দেওয়ালে না কিসে একটু ঘেঁষ্‌ড়ে গেল। কে যেন তাকে খাটের ওপরে নরম বিছানায় শুইয়ে দিলে। কার দুটি তপ্ত-ঠোঁট তার অধরে এসে মিল্‌ল! শোভনার মনে হোতে লাগ্‌ল কয়েক ঝলক গরম নিঃশ্বাস তার মুখে চোখে পড়তেই তার চমক ভেঙ্গে গেল। তার মনে হোলো যেন একটা অষ্টপদী তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেষ্টন কোরে রয়েছে। সে কঠিন বন্ধন থেকে মুক্তি পাবার আর কোনো উপায় নেই। চোখ দুটোকে জোর কোরে চেয়ে সে দেখতে পেলে রমেশ তার মুখের ওপরে ঝুঁকে রয়েছে। সে প্রাণপণ চেষ্টায় রমেশের আলিঙ্গন থেকে নিজেকে মুক্ত কোরে নিয়ে তাড়াতাড়ি খাট থেকে নেমে টলতে টলতে বড় ঘরে এসে সোফায় বসে হাঁপাতে লাগ্‌ল।

রমেশ বড় ঘরে আসতেই শোভনা জিজ্ঞাসা করলে—আমি কি অজ্ঞান হোয়ে পড়েছিলুম?

রমেশ আশ্চর্য্য হোয়ে বল্লে—না!

রমেশ একটা সিগারেট ধরিয়ে বল্লে—চল শোভনা এবার একটু বেড়ান যাক্ গিয়ে—

শোভনা জিজ্ঞাসা করলে—কটা বেজেচে?

যে খুব বিরক্ত করচি তা আমি বুঝতে পারচি রমেশদা—একবার বল তা হোলে আমি কাঁদব না—বল—বল—

রমেশ তার রুঢ়স্বরে একটু আদরের আমেজ মিশিয়ে বল্লে—শোভনা কি কর্‌চ। শোফারটা কি মনে কর্‌চে বল তো?

রমেশের কথা শুনে শোভনার কান্নার বেগ আরও বেড়ে গেল। প্রাণ-পণে সে কান্নাটাকে চেপে বল্লে—শোফার কিছু শুনতে পাবে না। তুমি আমার কানে কানে বল—কানে কানে—চুপি চুপি—

শোভনা রমেশের মুখের কাছে কানটা নিয়ে যেতেই রমেশ চেঁচিয়ে উঠ্‌ল—এই রোকো—

মোটরটা থামতেই রমেশ দরজা খুলে বাইরে নেমে পড়্‌ল। শোভনা মুখ বাড়িয়ে দেখলে যে গাড়ী এসে তার হোটেলের সামনে দাঁড়িয়েছে।

রমেশ শোভনার হাত ধরে গাড়ী থেকে নামিয়ে জিজ্ঞাসা করলে—তোমায় ওপরে পৌঁছে দিয়ে আসব—না একলাই যেতে পারবে?

শোভনার চোখের সামনে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তখন ঘুরছিল। অভিমানরুদ্ধ স্বরে সে বল্লে—না একলাই যেতে পার্‌ব।

রমেশ তার সঙ্গে সঙ্গে দরজা অবধি এগিয়ে এল। শোভনা জিজ্ঞাসা করলে—কাল কখন আসবে?

রমেশ একটু ঢোঁক গিলে বল্লে—আজ যখন এসেছিলুম।

শোভনা একটু ম্লান হাসি হেসে বল্লে—তোমাকে বোধ হয় খুব বিরক্ত করলুম। তুমিই তো—

শোভনার কথা থামিয়ে দিয়ে রমেশ বলে উঠ্‌ল—কিছু না—যাও অনেক রাত হয়েছে।

শোভনা তার হোটেলে ঢুকতেই রমেশ গিয়ে গাড়ীতে উঠ্‌ল।

কল্পনা দেবী কে, কোথায় তার কবিতার উৎস—কোন কথা লুকোবে না।

সন্ধ্যা হোয়ে গেল কিন্তু রমেশ এল না, রাত্রির সঙ্গে নিরাশার অন্ধকার শোভনার বুকের মধ্যে ঘনিয়ে উঠতে লাগ্‌ল। ঘড়ির কাঁটা ঘণ্টার পর ঘণ্টা পার হোয়ে যেতে লাগ্‌ল—রমেশের দেখা নাই। গত রাত্রিতে রমেশের ব্যবহারে শোভনার মনে যে সন্দেহের রেখা পড়েছিল তা ক্রমেই বাড়তে লাগ্‌ল। শোভনার মনে মধ্যে মধ্যে অনুশোচনার একটা তীব্র জ্বালা জেগে উঠতে লাগ্‌ল। আশ্বাসের প্রলেপ দিয়ে কিছুতেই সে জ্বালা থেকে অব্যাহতি পাচ্ছিল না। রাত্রি বারোটা বেজে যাবার পর সে বাতি নিভিয়ে বিছানায় গা ঢেলে দিলে।

সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে শোভনা স্থির করলে আজই সে ফিরে যাবে! কিন্তু তখুনি তার মনে হোলো হয়ত কোনো বিশেষ কাজ পড়ায় কাল রমেশ আসতে পারে নি। আজ সে নিশ্চয়ই আস্‌বে। বেলা এগারটার পর সে হোটেলের একজন চাকরের হাতে রমেশকে বার লাইব্রেরীতে একখানা চিঠি লিখে দিলে।

ঘণ্টা তিনেক বাদে হোটেলের লোক তার চিঠির উত্তর নিয়ে ফিরে এল। রমেশ লিখেছে—

শোভনা,

কাল বিশেষ কাজ পড়ায় তোমার ওখানে যেতে পারি নি। আজ একটা কাজে আমায় কলকাতার বাইরে চলে যেতে হচ্ছে। তোমার সঙ্গে যে সময়টুকু আমার কেটেছিল তা অনেকদিন মনে থাকবে। কলকাতায় এলে মাঝে মাঝে খবর দিলে সুখী হব। ইতি—

রমেশ

রমেশের চিঠি হাতে শোভনা খাটের ওপরে চুপ কোরে বসে রইল। সে

ভাবতে লাগল এই লোককে সে ভালবেসেছিল। এরই ধ্যানে কত দুঃখের দিন তার আনন্দে ভরে উঠেছে। এরই ধ্যানে সে যে কবিতা লিখেছে তারই প্রশংসায় আজ সকলে পঞ্চমুখ।

এই অবহেলা এই প্রত্যাখ্যানের লজ্জায় সে নিজেই অস্থির হোয়ে উঠ্‌ল, নিজের মনের এই ধিক্কারের হাত থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য সে হোটেল থেকে বেরিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতে আরম্ভ কোরে দিলে।

ঘুরে ঘুরে দেহটাকে একেবারে ক্লান্ত কোরে শোভনা যখন হোটেলে ফিরে এল তখন রাত্রি এগারোটা। হোটেলের কর্ত্রীর সঙ্গে দেখা হোতেই সে বলে দিলে—কাল সকালে আটটায় আমি চলে যাব। তার আগে এসে টাকা কড়ি নিয়ে যেও। ভোর হবার অনেক আগেই শোভনার ঘুম ভেঙ্গে গেল। বিছানায় পড়ে পড়ে সে ভাবতে লাগ্‌ল দু-দিন আগে এই সময়েই তার ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিল। কি আকুল আহ্বানে সেই ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে সে তার জীবনদেবতার কাছে তার মিনতি জানিয়েছিল। কিন্তু সে চিন্তা মনকে আঁকড়ে ধরবার আগেই সে বিছানা ছেড়ে উঠে কাপড় চোপড়-গুলো গুছোতে আরম্ভ কোরে দিলে।

লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখিকা

শৈলবালা ঘোষজায়ার

সই

বাঙ্গালীর হাসি-কান্নার আলোক-আঁধারে

এই সুন্দর উপন্যাসখানি আগাগোড়া ঝল্‌মল্ করিতেছে !

এই পুস্তক বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছে।

বিস্ময়কর কাহিনী

মর্ম্মস্পর্শী ও ওজস্বিনী ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে !

সই

হাস্য ও করুণ রসের চিত্র। বাঙ্গালীমাত্রেরই অবশ্য পাঠ্য,

এই শ্রেণীর পুস্তকের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

নারায়ণ ভট্টাচার্য্য প্রণীত

গিনীর মালা

ভাব, ভাষা, ভঙ্গী, মনোহর—গিনীর মত উজ্জ্বল,

জ্বল্ জ্বল্,—যিনি পড়িবেন তিনি বলিবেন

—"বাঃ"—

বর্ত্তমান রসদৈন্যতার দিনে বইখানি অভিনব।

গিনীর মালা

মরুভূমিতে তরুচ্ছায়ার ন্যায় তৃপ্তিকর।

সাহিত্যের অক্ষয় সম্পদ।

পুস্তকখানি চুম্বকের মত পাঠক-পাঠিকার মন আকর্ষণ করে।